

# বনমানুষ

## আবু ইসহাক

[লেখক-পরিচিতি : আবু ইসহাক ১৯২৬ সালের ১লা নভেম্বর শরীয়তপুর জেলার শিরঙ্গল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আই.এ. পাশ করার পরই সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি গ্রামবাংলার চিত্র এবং সেখানকার সমস্যা অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। এদিক থেকে তাঁর সূর্যদীঘল বাড়ি উপন্যাসটিকে বাস্তব জীবনের সার্থক চিত্রণের উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা যায়। উপন্যাস-সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি ১৯৬০ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো : সূর্যদীঘল বাড়ি, হারেম, মহাপতঙ্গ, পদ্মার পলিদ্বীপ ইত্যাদি। আবু ইসহাক ২০০৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।]

নতুন চাকরি পেয়ে কলকাতা এসেছি। সম্পূর্ণ অস্থায়ী চাকরি। যে-কোনো সময়ে, বিনা-কারণে ও বিনা নোটিশে বরখাস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। নিয়োগপত্রে এসব শর্ত দেখেও ঘাবড়াইনি একটুও। বন-বিভাগে চাকরি করতাম ষাট টাকায় এখানে পাব একশো তিরিশ টাকা। দ্বিগুণেরও বেশি। এমন সুবর্ণ সুযোগ কোনো নির্বোধ পায়ে ঠেলে দেয় বলে আমার মনে হয় না। আর যাই হোক, আমি দুপায়ে হাঁটি। জঙ্গলে যারা চার পায়ে হাঁটে, তাঁদের পরিবেশে থেকে আমার বুদ্ধিটা লোপ পেয়ে যায়নি। সত্তর টাকা বেশি পাব- এ কি যেমন- তেমন ব্যাপার! বিয়ে করেছি অল্পদিন। এখন দ্বিগুণ টাকারই দরকার। তাছাড়া জঙ্গল ছেড়ে এসেছি শহরে, হিংস্রালয় ছেড়ে লোকালয়ে, আঁধার ছেড়ে আলোকে। এরকম সভ্যসমাজে আসাটাও একটা মস্ত লাভ।

চাকরিতে যোগ দিয়েছি গতকাল। আজ দ্বিতীয় দিন, বৃহস্পতিবার। নটা না বাজতেই খেয়ে নিলাম তাড়াতাড়ি। মেসের খাওয়া। কী খেলাম বলব না, বলতে লজ্জা করে। তাছাড়া খাওয়াটা গৌণকর্ম, নেহায়েতই রান্নাঘরের ব্যাপার। যা মুখ্য তা হচ্ছে আমাদের পোশাক। সাজ-পোশাকই আমাদের সভ্যতার মাপকাঠি। কোনোভাবে শাকভাত খেয়ে বেঁচে থাকলেও এ-দেহকে দুরন্ত খোলসে ঢেকে ভদ্রলোক সাজতেই হবে। তাছাড়া উপায় নেই ভদ্রসমাজে বের হওয়ার। আমাদের মতো খুদে অফিসারদের ব্যাপার আরো জটিল। কোট-প্যান্ট পরে, টাই বেঁধে দুরন্ত হওয়া চাই, নয়তো ওপরওয়ালা সায়েবদের সুনজর হবে না কোনোদিন। তাঁদের কথা : ঘোড়ায় চড়ে না হোক, গাধায় চড়েও কেন আমরা তাদের অনুসরণ করব না? অফিসে তাই অনুকরণ ও অনুসরণের প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগের হয়ে দাঁড়ায়।

মেসের এক সদস্যের সাহায্য নিয়ে গলগ্রন্থিটা কোনোভাবে বেঁধে কোটটা গায়ে চড়িয়ে দিই। আয়নায় মুখ দেখে ভালো লাগে না। দাড়িগুলোর কালো মাথা দেখা যাচ্ছে। অথচ গতকালই দাড়ি কামিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি সেফটি রেজার বের করে ঐ অবস্থায়ই কয়েক পৌঁচ টেনে নিই। কিন্তু শার্টের কলারটায় সাবানের ফেনা লেগে যায়। তোয়ালে দিয়ে সেটা মুছে চুলে চিরুনি চালাই আর-একবার। তারপর জুতোজোড়া পায়ে ঢুকিয়ে আর একদফা আয়নায় মুখ দেখে বেরিয়ে পড়ি।

নটা বাজে। পথ সংক্ষেপ করতে গিয়ে একটা ছোট গলিতে ঢুকি। গলি নয় ঠিক। দুই দেয়ালের মাঝখান দিয়ে সরুপথ। গা বাঁচিয়ে একজন যেতে পারে কোনোমতে। মাঝপথে গিয়ে দেয়ালের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে হয় আমাকে। একজন বুড়ো ভদ্রলোক আসছিলেন ওদিক থেকে। দেহের

আয়তন তার নিতান্ত ছোটো নয়। তাই কোলাকুলিটা হয়ে যায় ভালোভাবেই। তারপর একজন, আরো এক, আরো একজন। কোলাকুলি সেরে বেরিয়ে যান তারা। কোলাকুলিটা যদিও সকলের সঙ্গে সমান জমে না, তবুও মনে হয় মানুষে মানুষে হানাহানির এ সময়টায় অজানা-অচেনায় এরকম কোলাকুলি বড় দুর্লভ।

আর মাত্র কয়েক কদম পার হলেই বড় রাস্তা। দেয়াল ছেড়ে সবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি, দেখি এক ভদ্রমহিলা গলিটায় ঢুকে পড়েছেন। আমার সামান্য কয়েক কদমের পথটুকু পার হবার সুযোগ না দিয়ে এগিয়েই আসছেন তিনি। এবার আর উপায় নেই। তাড়াতাড়ি পিছু হেঁটে শেষটায় উপায় করতে হয় আমাকেই।

দেয়ালে ঠেস দেওয়ায় শ্যাওলা লেগেছিল কোটে। রুমাল বের করে ঝেড়ে আমার পথ দেখি আমি। এবার আর সোজাপথে নয়। সোজাপথটাই দেখছি কঠিন বেশি। বেনেপুকুর লেন ঘুরে লোয়ার সার্কুলার রোড পার হয়ে ইলিয়ট রোডের মোড়ে এসে দাঁড়াই।

ধর্মঘাটের জন্যে ট্রাম বন্ধ। আমাকে যেতে হবে ৮ নম্বর বাসে। এক এক করে কয়েকটা বাস চলে যায়। কতবার হাতল ধরতে গিয়ে পিছিয়ে যাই। সাহসে কুলোয় না। লোকসব বাদুড়ঝোলা হয়ে যাচ্ছে। নিরাশ হবার পাত্র আমি নই। দাঁড়িয়ে থাকি, দেখি অন্তত একটা পা রাখবার জায়গাও যদি মিলে যায়।

একটা বাস এসে থামে। পা রাখবার জায়গা নেই। তবুও সব লোক ছোটোছুটি করছে, কে কার আগে উঠবে। চাকরি ঠিক রাখার কী প্রাণান্ত চেষ্টা। একটা লোক নেমে যায় ড্রাইভারের কুঠরি থেকে। মহাসুযোগ! পাশের কয়েকজনকে টেক্সামেরে চট করে উঠে পড়ি আমি। চাকরি গেলে আমার চলবে না। হঠাৎ আমার বুকে ধাক্কা মেরে একজন চেষ্টা করে ওঠে, ‘মানুষ, না জানোয়ার!’

লোকটা কি গণক নাকি! গণকের মতো ঠিকই তো বলেছে সে! আমি জঙ্গলেই তো ছিলাম অ্যান্ডিন! লোকটাকে ধন্যবাদ দেওয়ার ইচ্ছে হয়। কিন্তু সাহস হয় না। ঘাড়টা নুইয়ে গায়ে গায়ে মেশামেশি হয়ে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু মেশামেশিটা আগের কোলাকুলির মতো প্রীতিকর হয় না। আমি শেষে ঢুকে অনেকের অসুবিধে করেছি। ঠেলা-ধাক্কাটা তাই আমার দিকেই আসছে বেশি করে। পাঁজরের হাড়গুলো চাপ খেতে খেতে ভেঙে যাবে মনে হচ্ছে। আর দেরি নয়। পরের স্টপে থামতেই আমি নেমে যাই।

এতক্ষণ দম বন্ধ হয়েছিল যেন। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসকে সজীব করে নিই খোলা বাতাসে। স্যুটটার দিকে তাকিয়ে মায়া হয়। ভেতরের ঘামে আর ওপরের ঘষায় ইস্ত্রি ভেঙে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। এবার পাদুটোকে সম্বল করেই ছুটব ঠিক করলাম।

কলকাতা এসেছিলাম অনেকদিন আগে একবার। পথ-ঘাট ভালো মনে নেই। পথ চেয়ে পথ চলি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি চেয়ে দেখতে হয় পথচারীদের পোশাকের দিকে। এই পোশাক ছাড়া কার কী ধর্ম জানবার উপায় নেই। কারণ ধর্মের কথা গায়ে কিছু লেখা থাকে না। সব ধর্মাপরাধীদের চেহারাই মানুষের চেহারা। আমার চেহারা দেখে কিন্তু কারো বুঝবার যো নেই, আমার ধর্ম কী। কারণ আমার মানুষের শরীরটাকে আন্তঃধর্মিক পোশাকে ঢেকে নিয়েছি। তাই বলে কি আমি নিরাপদ?

আন্তঃধর্মিক পোশাকে মানুষের চেহারা হলেও যে-কোনো দিকের চাকু খাওয়ার ভয় আছে আমার। মুসলমান মোটেই না। আমার বিপদ বরং বেশি। আমাকে হিন্দু ঠাওরালে, আর হিন্দু মুসলমান ঠাওরালেই হলো!

ভয়ে বুকটা দুরুদুরু করে। মন ইতিমধ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। একশো তিরিশ টাকার চাকরিটার ভার ছেড়ে দিই পাদুটোর ওপর। শুধু তাই নয়, মনের বিরুদ্ধে সমস্ত দেহের ভারটাও।

এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় পা দিয়ে থমকে দাঁড়াই। কাছাকাছি একটা প্রাণীও দেখছি না যে! বুকের ভেতরটা দুলে ওঠে। সুমুখের একটা দোতলা বাড়ির দিকে চোখ পড়তেই দেখি, জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কয়েকজন কী যেন দেখছে রাস্তার দিকে। ওপর থেকে নিচের দিকে চোখ নামাতেই চোখ ফিরে আসে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যায়। গায়ের রোম কাঁটা দিয়ে ওঠে। চিনতে ভুল হয় না। মানুষ! ছমড়ি খেয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত মানুষ। রক্তের রাঙা স্রোত ড্রেনে গিয়ে মিশেছে।

নিমেষে পেছন ঘুরে অন্য পথ ধরি। গাড়ির আওয়াজ পেয়েও তাকাই না ফিরে। কিন্তু কে যেন গর্জে ওঠে, 'ঠায়রো।'

দুজন সার্জেন্ট রিভলবার হাতে এগিয়ে আসে। আমাকে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখে তারা। কিন্তু ফাঁসাতে পারে না। নিয়োগপত্রটা পকেটেই ছিল। সেটা দেখিয়ে রেহাই পেয়ে যাই।

এবার আরেকটা রাস্তা ধরে হাঁটি। হাঁটি সুমুখে পেছনে চেয়ে। মারটা নাকি পেছন থেকেই আসে। এক একজন লোক চলে যায় পাশ কেটে, মনে হয় এক-একটা ফাঁড়া কেটে যায় আমার। আমার সতর্ক চোখদুটো আড়চোখে তাকায় সবার দিকে। কিন্তু তারাও যে সতর্কদৃষ্টি মেলে আমারই দিকে তাকায়! আমাকে-আমার হাত দুটোকেই বোধহয় তাদের ভয়। তাদের ভীত চাউনি দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আমিও আমার অনুগত হাত দুটো ছাড়া আর কারো হাতকে বিশ্বাস করতে পারি না।

কিছুদূর আগে ডানদিকে একটা পাশগলি। গলির মুখে তিনটে লোক। তাদের পোশাক দেখে চমকে উঠি। তাদের ভাবগতিকও কেমন যেন সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমার বুকের ভেতরটা টিপটিপ শুরু হয়েছে। আশেপাশে লোকজন নেই। পেছনে তাকিয়ে দেখি এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান তরুণী উঁচু-গোড়ালি জুতো পায়ের আসছে গটগট করে। আমার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে যায়। আমি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে যাই। গলির মুখের লোকগুলোকে বোঝাতে চাই, আমি তরুণীটির জন্যেই অপেক্ষা করছি। তারই সাথী আমি। কিন্তু তারা বুঝতে চাইলে হয়। আমার যেরকম গায়ের রং! অবশ্য এরকম রঙের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের অভাব নেই কলকাতা শহরে।

আমার পোশাক দেখে লোকগুলো না হয় আমাকে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ঠাওরাল। কিন্তু তরুণীটিকে কী বোঝাব? আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কী মনে করবে সে?

আমি উবু হয়ে বাঁ-পায়ের জুতো খুলি। জুতোর ভেতর কাঁকর ঢুকেছে এমনি ভান করে জুতোটা উপুড় করে ঝেড়ে নিই কয়েকবার। তারপর আবার পায়ের ঢুকাই। তরুণীটি আমার কাছে এসে গেছে। জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ করে এবার তার পাশাপাশি চলতে শুরু করি। এখন ঠিক মনে হচ্ছে— রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান দম্পতি। অন্যের কী মনে হচ্ছে জানি না। আমার কিন্তু ওরকমই মনে হচ্ছে। এক-পা-দুপা করে গলির মুখ পার হয়ে যাই।

ফাঁড়া কেটে গেছে। আমার নীরব সঙ্গিনী একবার কটমট করে আমার দিকে তাকায়। তার চোখের দিকে চেয়ে আমার মনটা মিইয়ে যায়। কিন্তু তবুও তার সদ ছাড়তে ভরসা পাইনে।

পাশাপাশি হেঁটে আরো কিছুদূর এগিয়ে যাই। হঠাৎ আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলে সে, 'আমার পিছু নিয়েছ কেন?'

'না-না-।' আমি থতমত খেয়ে যাই।

'না মানে! বহুক্ষণ ধরে আমি লক্ষ করছি। পুলিশ ডাকব?'

'না-না, মানে-ইয়ে, মানে গুন্ডার ভয়ে'-

'গুন্ডার ভয়ে!'

'হ্যাঁ, তাই-তাই আপনার সাথে সাথে এলাম।'

'অবাক করলে! এক জোয়ান পুরুষ, তাকে রক্ষা করবে মেয়েমানুষ! আচ্ছা কাপুরুষ তো!' অবজ্ঞার হাসি তরুণীটির মুখে।

কিছুদূর গিয়ে মহিলা বাঁ-দিকে এক গলিতে ঢুকে পড়ে। আমি মোড় নিই ডানদিকে।

পাশ থেকে একটা হাত এগিয়ে আসছে না আমার দিকে।

'উহ্ মাগো' বলে লাফ দিয়ে সরে যাই কয়েক হাত। ফিরে দেখি একজন জটাধারী ফকির হাসছে আমার অবস্থা দেখে। এগিয়ে এসে সে বলে, 'ভয় পেলি নাকি? দুদিন খেতে পাইনি। দুটো পয়সা দে।'

রীতিমতো ঘাম দিয়েছে আমাকে। মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। তবু হাতে চাকু না-থাকার জন্যে ফকিরটাকে ধন্যবাদ দিই মনে-মনে আর পকেট থেকে দুটো পয়সা বের করে তার দিকে ছুঁড়ে মারি। চৌরঙ্গী এসে পড়েছি। একটা লোক হঠাৎ আমার পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, 'ফটো তুলবেন? আসুন। এক টাকায় তিন কপি।'

লোকটার কথার জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাই। কিন্তু ভুল হয়ে গেল। মানুষের ভয়ে ভীত মানুষের ফটোটা তুলে রাখা উচিত ছিল আমার।

হঠাৎ কার স্পর্শে শিউরে উঠি।

চেয়ে দেখি, আমাদের সুভাষ মুচকি হাসছে। সহপাঠী বন্ধুর আলিঙ্গনে বুকের ভেতরটা যেন ভিজে ওঠে। কিন্তু ওর বুকটা শক্ত লাগল না! জামার ওপর হাত রাখি। তাই তো!

সুভাষ হেসে বলে, 'হাত দিয়ে দেখছিস কী?'

'দেখছি, মানে-তোর বুকটা শক্ত লাগছে কেন রে?'

'শক্ত লাগছে হুঁহু হুঁ! এ জিনিস দেখিস নি কখনো। লোহার তারের গেঞ্জি। একেবারে নয়া আবিষ্কার।

'নয়া আবিষ্কার।'

'হ্যাঁ, এ বর্ম ভেদ করবে চাকু? উহু-!'

সুভাষের জামার ওপর হাত দিয়ে দিয়ে আঁচ করতে পারি, লোহার তার দিয়ে তৈরি হাতাকাটা গেঞ্জি। মন্দ জিনিস নয়। সহসা আঘাত করে কিছু করতে পারবে না।

আমি হেসে বলি, 'কিরে চাকু-টাকু লুকানো নেই তো?'



‘নেই তো কী! নিশ্চয়ই আছে। এফুনি তোর বুকে বসিয়ে দেব। তোর রক্ত দিয়ে ফোঁটা-তিলক কেটে কালীপূজা করব।’

‘এখানে কী করিস?’

‘পড়ি আর্ট স্কুলে।’

‘আর্ট স্কুলে! ঠিক আছে। শোন, তোকে একটা ছবি আঁকতে হবে। মানুষের ভয়ে মানুষের চেহারা কেমন হয়, ফুটিয়ে তুলতে হবে সে ছবিতে। পারবি তো?’

‘তা দেখব চেষ্টা করে।’

আরো দু-এক কথা বলে বিদেয় হই তাড়াতাড়ি।

হেঁটে হেঁটে চৌরঙ্গী পর্যন্ত আসি। কিন্তু পা আর চলে না। চলবার কোনো হেতু নেই যে! ভোরে যা খেয়েছি, আর এ-পর্যন্ত এক পেয়ালা চা-ও না। কার্জন পার্কে বসে পড়ি। হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। ভিড় কমলে বাসেই যাব।

সাড়ে ছ’টার সময় বাসে একটু জায়গা পাওয়া যায়। পঁ-পঁ করতে করতে বাস ছুটছে। এত ভিড়, বাইরের কিছুই দেখা যায় না। বুঝতে পারছি না, কোন রাস্তা ধরে চলছে গাড়ি।

বুম্-ম্-

আবার বুম্-ম্-

ভীষণ শব্দ। কানে তাল লাগে গেছে। শুনতে পাই না কিছু। শ্যোলের ভয়ে খাঁচার মোরগের মতো করছি আমরা। তারপর কোন দিক দিয়ে কেমন করে বাসখানা চলে এল, অত খেয়াল নেই। কয়েকজনের মুখে শুনলাম, বাসের পাদানির ওপর থেকে দুজনকে দুপেয়ে শ্যোলে টেনে নিয়ে গেছে। আর অনেকের হাত-মুখ নাককান ছিঁড়ে গেছে বোমার আঘাতে।

ঘরের কাছে এসেও আর-একবার শিউরে উঠি। অন্ধত দেহে পৈতৃক প্রাণটা নিয়ে ফিরে এসেছি আমি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। শিথিল শরীরটাকে টেনে এনে বিছানায় ঢেলে দিই। মানুষের মাঝে একদিন চলেই মুষড়ে পড়েছি আমি। আমার সমস্ত রাগ ঘৃণা আজ মানুষের ওপর।

চোখ বুজে ভাবছি- পদত্যাগপত্রটা প্রত্যাহার করার এখনো হয়ত সময় আছে। আমার জন্যে বন-বিভাগের চাকরিটা ভালো। মানুষ তার মনুষ্যত্ব নিয়ে শহরে থাক। আমি বনে গিয়ে আবার বনমানুষ হব। □

**শব্দার্থ ও টীকা :** হিংস্রালয়- হিংস্র প্রাণীর বাসস্থান। গলগ্রহি- গলার বন্ধনী। ছাতলা- শ্যাওলা, দেয়ালে জমা পুরানো ময়লা। অ্যান্ধিন- এতদিন শব্দের কথ্যরূপ। ঠায়রো- দাঁড়াও। ঠাওরালো- মনে করল। চৌরঙ্গী- চার রাস্তার মিলনস্থল। কলকাতার একটি স্থানের নাম।

**পাঠ-পরিচিতি :** ভারত বিভাগের আগে ১৯৪৬ সালে এ অঞ্চলে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়েছিল। এ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে ‘বনমানুষ’ গল্পটি লিখিত। এ গল্পের লেখক বনবিভাগে সামান্য বেতনে চাকরি করতেন। তিনি দ্বিগুণ বেতনে কলকাতায় চাকরি করতে আসেন। কলকাতায় এসে প্রথমে তাঁর নিজেকে সভ্য মানুষ মনে হতে থাকে। কিন্তু তিনি তখন সাম্প্রদায়িক হানাহানির মুখোমুখি হতে থাকেন। তিনি দেখেন এ শহরের মানুষেরা ধর্মের নামে পরস্পরকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। বনের পশুপাখিরাও এ রকম পরস্পরকে হত্যা করে না। তখন লেখক আবার বনবিভাগের চাকরিতে ফিরে

যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। লেখকের কাছে এ শহরের সভ্য মানুষের চেয়ে বনে বসবাসকারী অশিক্ষিত মূর্খ মানুষকে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়। 'বনমানুষ' গল্পটি সংকীর্ণ ধর্ম-পরিচয়মুক্ত মানবিক বোধসম্পন্ন চিন্তায় উদ্ভূত হতে সহায়তা করে; কারণ ধর্ম নিয়ে মানুষে সংঘাত মানুষ পরিচয়টিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। কেননা জীব হিসেবে মানুষ অন্য সব প্রাণীর তুলনায় জ্ঞান, বুদ্ধি ও সৃষ্টিশীলতায় শ্রেষ্ঠ।

## অনুশীলনী

### কর্ম-অনুশীলন

- ১। তোমার দেখা অন্য ধর্মের প্রধান একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিবরণ দাও।
- ২। ঢাকা শহরের রাস্তায় তোমার একদিনের যাতায়াতের বর্ণনা দাও।

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- ১। লেখক কোনটিকে গৌণকর্ম মনে করেন?
 

ক. কোট পরা	খ. খাওয়া
গ. বেতন নেওয়া	ঘ. অফিসে যাওয়া
- ২। 'আঁধার ছেড়ে আলোকে' এখানে কোনটিকে আঁধার বলা হয়েছে?
 

ক. শহুরে জীবন	খ. অন্ধকার অবস্থা
গ. বনের জীবন	ঘ. আলোকিত অবস্থা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪-সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও :

বন্যা শেষে তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দেয়। এ সময় বিমান এসে বস্তাভর্তি খাবার ফেলে দিলে মানুষ, পশু, পাখি সবাই ক্ষুধা নিবারণ করে। কিছুদিন পর আবারও বিমান আসে। চড়ুই দম্পতি তা দেখে ভীষণ খুশি। এক সময় বিমান থেকে ফেলা বোমার আঘাতে মারা যায় মানুষ, পশু, পাখি। ধ্বংস হয় গাছপালা। তখন ঐ চড়ুইয়ের কণ্ঠে শোনা যায় ছি! ছি!! ছি!!!

- ৩। উদ্দীপকে ফুটে ওঠা যে বিষয়টি 'বনমানুষ' গল্পের বিশেষ দিককে ইঙ্গিত করে, তা হলো—
  - i. আধুনিকতা
  - ii. নেতিবাচক মনোভাব
  - iii. সভ্যতার মুখোশ

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪। চডুইয়ের অনুভূতির সঙ্গে লেখকের একাত্মতা প্রকাশে কোন বক্তব্যটি যথার্থ?

- ক. অনুকরণ ও অনুসরণের প্রতিযোগিতা বেশ উপভোগের।
- খ. সাজ-পোশাকই আমাদের সভ্যতার মাপকাঠি।
- গ. অজানা-অচেনায় এ রকম কোলাকুলি বড় দুর্লভ।
- ঘ. আমি বনে গিয়ে আবার বনমানুষ হব।

### সৃজনশীল প্রশ্ন

গ্রীষ্মের ছুটিতে মনির তার মামার বাড়ি কলকাতায় বেড়াতে গেল। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই মামাবাড়ি তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। মামা, মামি, মামাতো ভাই-বোনরা তার সাথে ভালোভাবে কথা বলত না। মামি তার দ্বারা অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া শুরু করল। মামাবাড়ির বন্ধ দেয়াল তার কাছে জেলখানা মনে হলো। তার বারবার মনে পড়তে লাগল ফেলে আসা গ্রামের বিরাট সবুজ মাঠ, নদী, বন্ধু-বান্ধব, আপনজনের চেহারা।

- ক. ধর্মঘটের জন্য কী বন্ধ হয়েছিল?
- খ. কথক বনে গিয়ে আবার বনমানুষ হতে চান কেন?
- গ. উদ্দীপকের যে ভাবটি ‘বনমানুষ’ গল্পে পাওয়া যায় তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “উদ্দীপকের মনির যেন ‘বনমানুষ’ গল্পের কথকেরই প্রতিনিধিত্ব করছে”—উক্তিটি যুক্তিসহ বুঝিয়ে লিখ।